প্রথম অধ্যায়

ঊনবিংশ শতকে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মজাগরণ

উনিশ শতকে বাংলায় আধুনিকতার সূত্রপাত হয় একথা সর্বজন স্বীকৃত। এই আধুনিকতা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব জাত একথাও স্বীকার্য। চলমান সভ্যতার শিক্ষা সংস্কৃতি এদেশে আধুনিকতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। আত্মসচেতনতা, রাজনৈতিক চেতনা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জীবন দৃষ্টির ভিন্নতা, নতুন সামাজিক শ্রেণির বিকাশ, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। উনিশ শতকে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতার প্রায় পরস্পর বিরোধী দুই ধারা সচেতন মনে মানব জীবন সম্বন্ধে নবজিজ্ঞাসার সূত্রপাত করে। জিজ্ঞাসা সচেতন বাঙালির জীবনে তা প্রসারিত হয়েছে প্রচলিত ধর্ম সমাজিক রীতিনীতি ও রাজনৈতিক ভাবনাকে কেন্দ্র করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে খ্রীষ্টধর্মের অভিঘাত বাঙালির জীবন ও চিন্তার ক্ষেত্রে একটা প্রবল আলোড়ন আনে। নব্য ইংরেজি শিক্ষিত পাশ্চাত্য দর্শনের শিক্ষা পুষ্ঠ মানুষেরা হিন্দুধর্মের নানা আচার, বহুদেববাদ এবং সামাজিক রীতিনীতির উপর ধর্মের অনুশাসন মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁরা অনেকেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মের নামে লোকাচার, কুসংস্কারগুলির দিকে আঙুল তুলে হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ হতে লাগল। তখন সনাতনীরা যুগধর্মের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে প্রাচীন সংস্কারকে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন। আর নব্য শিক্ষিত মানুষেরা সনাতন হিন্দুধর্মকে অস্বীকার করতে চাইলেন। নব জাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন। অতীতের শাস্ত্রগ্রন্থ অন্বেষণ করে ভারতীয় ঐহিত্য থেকে জীবনের নতুন দর্শন, নতুন চর্যা আবিষ্কারের চেষ্টা অনেকে করলেন। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু, একাজের অন্যতম পথিক। ঊনবিংশ শতকের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের অন্যতম ব্যক্তি হলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত মানুষদের সঙ্গে সমপর্যায়ে চলার যোগ্যতা তাঁর কর্মের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুর ভারতের জ্ঞানচর্চা ও প্রজ্ঞার গভীর থেকে তুলে আনলেন মানুষের ধর্মীয় সনাতনী ভাবধারাকে।

অষ্টাদশ শতকে বঙ্গদেশে ধর্মের নামে কুসংস্কার ব্যভিচার সামাজিক ভ্রষ্টাচার, সামাজিক ভেদ বৈষম্য, অস্পৃশ্যতাও দারিদ্র চরম আকার ধারণ করেছিল। এই সময়ে ধর্মের নামে গুরুবাদ ও গুরুমন্ত্রের একাধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। সমাজে গুরুবাদের প্রাবল্য ধরা পড়েছে বিনয় ঘোষের 'বাংলার সামাজিক হতিহাসের' মধ্যে। তিনি গুরুবাদ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, ঊনবিংশ শতকের সমাজ বাস্তবতার রূপের তার কিছুটা অংশ তুলে ধরলাম—

> ''গুরু ব্যবসা আজকাল যে রূপ ভাব ধারণ করিয়াছে আফ্রিকার দাস ব্যবসা তাহার নিকট হার মানে। ভিন্ন ধর্মাক্রান্ত কোন লোকে যদি আমাদের ধর্মের উপর একটুও বা কটাক্ষপাত করে অমনি আমাদের স্বধর্ম প্রিয়তার বৃদ্ধি হয়। সর্পের লাঙ্গুলে অমনি যেন পা পড়ে। বিলাতে গিয়া যদি কেহ কখনও অখাদ্য ভোজন করিয়া আসিয়া আবার হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে চান, অমনি সংস্কারকগণ সহস্র কণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু স্বধর্মে ধর্মের নামে অধর্মের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, সমাজের ভিতর তাহাদের একটা শাসন করিবার জন্য কাহারও চেষ্টা নাই।''[১]

হরিচাঁদ ঠাকুর বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় বড় হয়েছিলেন। ফলে বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ সামাজিক জীবন থেকেই জ্ঞাত ছিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর সূক্ষ্ম সনাতন নামে সনাতন ধর্মের পুনরজাগরণ ঘটান উনিশ শতকে। গ্রামের ধর্মীয় পরিবেশে হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন বাস্তবতার মূর্ত প্রতীক। হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাবের কারণ হিসাবে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে বলেছেন—

> ''নমঃশূদ্র কুলে এল পতিত পাবন।।
> ঘুচাতে জীবের সন্দ চিত্ত অন্ধকার।
> ওড়াকান্দি ধামে হরিচাঁদ অবতার।।''[২]

হরিচাঁদ ঠাকুর স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ধর্মের নামে গোটা দেশ অধর্মের মধ্যে ডুবে আছে। একটা দুটো আচার নিয়ম রীতির সংশোধন করে ধর্মীয় পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তাই তিনি শুদ্ধ মানুষে ভক্তি বিশ্বাস রেখে নব ভাবে ধর্মীয় পথ নির্মাণে

আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দীক্ষার অছিলায় গোটা ভারত যখন গুরুবাদে বুঁদ হয়ে ছিল তখন তিনি মানুষকে গুরুবাদ মুক্ত করবার জন্য বললেন দীক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। তীর্থ ভ্রমণেও কোন পূণ্য নেই, সৎ আদর্শ মানুষের সান্নিধ্যেই অনেক বেশি পূণ্য অর্জিত হয়।

হরিচাঁদ ঠাকুর দীক্ষা সম্পর্কে মানুষকে মোহ মুক্ত করেন। সত্যের জ্ঞানাআলোক দান করেন মানুষের কল্যাণে। সমাজে প্রচলিত দীক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা পূজাপার্বণকে বর্জন করে 'হরিনাম' মহামন্ত্র জানালেন। তীর্থ ভ্রমণের প্রয়োজনকে গৃহে থেকেই গৃহী মানুষকে পূর্ণ করার পথ নির্দেশ করলেন এভাবে—

''যত যত তীর্থ আছে অবনী ভিতরে।
সত্য বাক্য সমকক্ষ হইতে না পারে।''[৩]

গৃহধর্ম পালন ও তীর্থ ভ্রমণের পূণ্য লাভ করার দিক নির্দেশ করলেন। তীর্থ ভ্রমণে যে পূণ্য লাভ হয় সেই সম পূণ্য লাভ হয় জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী মানুষের দরশনে। গৃহী মানুষেরা যদি জিতেন্দ্রিয় হয়ে গহধর্ম পালন করেন; তাহলে তাঁকে দরশন করলেও সর্ব তীর্থ দর্শন হয় মানুষের। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর বললেন

''দেহের ইন্দ্রিয় বশ করেছে যে জন।
তার দরশনে সব তীর্থ দরশন।''[৪]

হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেই গৃহধর্ম পালন করেছেন ও সকল ভক্ত মানুষকেও গৃহধর্ম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন গৃহধর্ম পালনের মধ্যেই মানুষের, জ্ঞান, ভক্তির বিকাশ ঘটান সম্ভব। গৃহধর্ম গৃহকর্ম পালনের মধ্য দিয়েই মহাসাধু হওয়ার কথা বলেন।

''গৃহেতে থাকিয়া যার ভাবোদয় হয়।
সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়।।''[৫]

হরিচাঁদ ঠাকুরের 'আত্মানুভূতিও আত্মদর্শন' থেকে জানা যায় ধর্মকে কীভাবে গঠন করলে মানুষের সার্বিক কল্যাণ হয়, সেই পথ অবলম্বন করে মানুষের কল্যাণে ব্রতী হলেন তিনি। হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর সমকালে দেখেছিলেন ধর্ম পালনের প্রকৃতিকে। আত্মদর্শন করে হরিচাঁদ ঠাকুর সিদ্ধান্ত নেন—প্রচলিত ধর্মের থেকে মানুষকে বের করে মোহমুক্ত করে মানুষকে প্রকৃত ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে। হরিচাঁদ ঠাকুর ধর্ম শিক্ষা দিতে উদ্দ্যোগী হন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনায়—

''শুদ্ধচারী, বীজমন্ত্রী, নামে জপে মালা।
একা একা যেতে চায় সমুদ্রেতে ভেলা।।
গুরুরূপে ব্যবসায়ী কানে দেয় মন্ত্র।
প্রাণহীন দেহ যেন জুড়ে অঙ্গে যন্ত্র।।
এসব সামান্য কূপ সব ডুবে যাবে।
হরি প্রেম প্লাবণেতে জীব মুক্তি পাবে।।
দেহ মন শুদ্ধ হলে স্থির হবে আত্মা।
তখন শিখাতে হবে গৃহ ধর্ম কথা।।''[৬]

মানুষের মোহ মুক্তির জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর ধর্মাদর্শ এবং ধর্মীয় আচরণের মধ্যেই রাখলেন সংঘবদ্ধভাবে চলার আদর্শকে। ধর্মসাধনায় একক মুক্তির প্রয়াসকে তিনি বিস্তার ঘটালেন নামকীর্ত্তনের মধ্যে। একা মুক্তির স্বপ্ন হরিচাঁদ ঠাকুরের ছিল না। তাই 'হরিবল' নাম কীর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন ভক্তিভাবের মহাতরঙ্গ। সব জাতপাতের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে 'হরিনাম' মহানামের মাধ্যমে তৈরি করেছিলেন এক অভূতপূর্ব ঐক্য।

হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম জাগরণ ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারের মধ্যে নিহিত। হরিচাঁদ ঠাকুর ভারতীয় ধর্ম প্রবাহের ঐতিহ্যের মধ্য থেকেই তার কর্ম ও চিন্তাকে সংগ্রহ করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁর 'ভারতীয়ত্বের আধারে' নামক প্রবন্ধে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম জাগরণের বিষয়বস্তুকে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার কিছুটা অংশকে তুলে ধরলাম—

''...দেশীয় ইতিহাসের অনিবার্য গতি আর ভারতীয় লোক ঐতিহ্যের পরম্পরার ভিতর থেকেই তিনি উঠে এসেছিলেন। পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হবার পর তাদেরই অনুকরণে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন বিষয়টা এমন ঘটে নি। ... বুদ্ধদেব বা চৈতন্যদেব কিম্বা কবীর, নানক প্রমুখরা যেমন ভারতের প্রবহমান লোকচৈতন্যের ভেতর থেকেই নিজেদের কর্ম ও চিন্তার প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন, হরিচাঁদ ঠাকুরও তাই। তাঁকে আমরা সেই

ধারার সর্বশেষ এবং আধুনিকতম মহামনীষী (ধর্মের ব্যাখ্যায় অবতার) হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। তথাকথিত সনাতন ধর্মের অচলায়তন ভেঙে ধর্ম ব্যবসায়ী ও কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের বিস্তার করা মোহজাল ছিঁড়ে ভারতীয় চেতনার পুনরাবিষ্কারের মধ্য দিয়েই তিনি নতুন পথ খুঁজে নিয়েছিলেন। একে তিনি বলেছেন সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম।''[৭]

সনাতন ধর্ম দর্শনের বিবর্তিত রূপ সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম বা মতুয়া ধর্ম দর্শন :

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সময় অনুযায়ী হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন আধুনিক যুগে। এই আধুনিকতা বাঙালির চেতনায় ধরা পড়ে উনিশ শতকে। ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙালির আত্মচেতনার জাগ্রত কাল। যে মানবতাবাদ বাঙালি গ্রহণ করল তা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবিত। এই মানবতাবাদ প্রচলিত হল তা কিন্তু মূলত শহরাঞ্চল ভিত্তিক। কিন্তু বাঙালি জীবন শুধুমাত্র কলকাতা কেন্দ্রিক নয়, মূলত গ্রাম নির্ভর বা কৃষিনির্ভর। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের যে ভাবধারার সূচনা হয় সেই ধর্মীয় জাগরণের দুই রূপকার সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা যাক তারা কীভাবে কি ধর্মীয় ভাব দ্বারা মানুষকে মনুষত্ববোধের মহিমায় উন্নীত করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের দুই ধর্ম জাগরণের রূপকার হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সফলাডাঙা গ্রামে। শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর যে ধর্মভাবনা ও জীবনাদর্শের মাধ্যমে মানুষকে চালনা করেছেন। সেই সমস্ত কাজকর্মের তথা তার জীবনের যে আলেখ্যপূর্ণ আকরগ্রন্থটি হল— কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের রচিত 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত'। গুরুচাঁদ ঠাকুরের কর্ম ও ধর্মজীবনের আকরগ্রন্থ হল আচার্য মহানন্দ হালদার বিরচিত 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত'। এছাড়াও হরিচাঁদ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে যে ধর্ম দর্শনের প্রবর্তন হল সেই ভক্ত সাধকেরা তাদের ধর্মগুরুর কথা গানের মাধ্যমেও প্রকাশ করলেন। সেই আকরগ্রন্থগুলিও এই সময়ের এক বিশেষ সাহিত্য ধারা তথা ধর্মসাহিত্য ধারা। ধর্মভাবনার কথা বলতে গেলেই পূর্ব পূর্ব ধর্ম ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। আলোচনার সুবিধার জন্য মূল আকরগ্রন্থগুলিই ব্যবহার

করব। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে 'পুনর্ব্বার অবতারের প্রয়োজন ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাগবত ও পুরাণ প্রসঙ্গ' থেকে জানতে পারি হরিচাঁদ ঠাকুর ঊনবিংশ শতকের মানুষকে নিয়ে কোন ধর্ম ভাবনার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কবির বর্ণনায়—

''মানব কুলে আসিয়ে যশোবন্ত সুত হয়ে,
জন্ম নিল সফলা নগরী।।
প্রচারিল গঢ়াগম্য সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম,
জানাইল এজগত ভরি।।''[৮]

সত্য, প্রেম, পবিত্রতা এবং বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের উপর প্রবর্তিত ধর্ম দর্শনই ভারতের আদি ধর্মদর্শন। যা সনাতন (পুরানো) ধর্মদর্শন নামে খ্যাত। যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ৬৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের ও পূর্বে। সিন্ধু সভ্যতার নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ছিল এই ধর্ম দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সনাতন ধর্মকে আবার ভূতের ধর্মও বলা হয়। কারণ এই ধর্ম মূলত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম নামক পঞ্চভূতের বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; যা ছিল সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল। ১৯৮৫ সালের ১৪ অক্টোবর বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এই সনাতনী ভূতের ধর্ম দর্শনের। সোভিয়েত রাশিয়ায় জাতিগত বিজ্ঞানের উপর অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের এক আলোচনা সভায় বলা হয়, আর্যদের ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করার প্রায় ৫০০০ হাজার বছর আগে সিন্ধু উপত্যকায় অতি উন্নত মানের এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের তত্ত্ব আর্য সভ্যতা বহির্ভুত প্রাচীনতম ভারতীয় ধারকদেরই আবিষ্কার। তাই সনাতন ধর্মকে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম বলা হয়।

হরিচাঁদ ঠাকুর এই প্রাচীন ভারতীয় সনাতনধর্মকে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে পুনজাগরণ ঘটান। এই ভূতের ধর্ম বা সনাতন ধর্ম ছিল সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল। এই সনাতন ধর্ম সংস্কারকদের বলা হত বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী। গৌতম বুদ্ধ এই সনাতনধর্মকে সংস্কার করেন বৌদ্ধধর্ম নামে। আবার হরিচাঁদ ঠাকুরও সনাতনধর্মকেই সংস্কার করেন ঊনবিংশ শতকে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে। হরিচাঁদ ঠাকুর সনাতন ধর্মকে যুগ প্রয়োজনে মানুষের উপযোগী করে সংস্কার করেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার বলেছেন—

''বুদ্ধের কামনা তাহা পরিপূর্ণ জন্য।

যশোবন্ত গৃহে হরি হৈলা অবতীর্ণ।''[৯]

গৌতম বুদ্ধ পঞ্চভূতের ধর্মকে সংস্কার করেন। আবার হারিয়ে যাওয়া ভূতের ধর্মের বা সনাতন ধর্মের সংস্কার করেন হরিচাঁদ ঠাকুর। শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর পুত্র শশীভূষণ ঠাকুরকে সনাতন ভূতের ধর্মে কীভাবে মানবদেহ গঠিতও মানুষ কেমন করে জাগতিক জীবন অতিবাহিত করে তাই বর্ণনা করেছেন। আচার্য মহানন্দ হালদারের বর্ণনায়—

''পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে ঘুরে ব্রহ্ম পরাৎ পর।
ব্রহ্ম ধরে আত্মানাম তত্ত্বে দেহ কয়।।
উভয়ে মিলন হলে জীব সৃষ্টি হয়।।
ভূত'ত আধার মাত্র দেহ নাম ধরে।
চিৎ শক্তি আত্মা আছে তাই চলে ফিরে।।''[১০]

ঊনবিংশ শতকে হরিচাঁদ ঠাকুর সূক্ষ্ম সনাতনধর্মকে গৃহধর্ম পালনের মধ্যেই এক যোগে পালন করার রীতি প্রচার করলেন। ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে আধ্যাত্ম জীবন গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে বিরোধ নেই। হরিচাঁদ ঠাকুরও আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে গৃহধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন যাপনের পথ নির্দেশ দিলেন। মুক্ত প্রাণে মানুষের জীবন যাপনের পথ নির্দেশ দিলেন। গৃহধর্ম পালন করার আদর্শ স্থাপন করার কথা কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনায় হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম-কর্ম নীতিতে গৃহধর্ম জীবনের প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত হল—

''হাতে কাম মুখে নাম, মন খোলা চাই।
সহজ গার্হস্থ্য ধর্ম সর্ব ধর্ম সার।
গৃহীকে বিলাবে মুক্তি শ্রীহরি আমার।।''[১১]

গৃহ ধর্মকেই সমাজ জীবনের সর্বধর্ম শ্রেষ্ঠ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর। আচার্য মহানন্দ হালদার মহাশয় 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুর গৃহধর্মের শিক্ষা দিয়েছেন গুরুচাঁদ ঠাকুরকে সেই প্রসঙ্গটি যথাযোগ্যভাবে বর্ণনা করেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রতি হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহধর্ম শিক্ষা যে মানুষের আদি শিক্ষা, গৃহধর্ম পালনের মধ্যেই সর্ব তীর্থ সব পূণ্য অবস্থান করে সঠিক ভাবে পালনের মধ্যে সেই বাণীই ব্যক্ত করেছেন। আচার্য

মহানন্দ হালদারের বর্ণনায়—

''শোন পুত্র প্রাণাধিক, তব প্রতি সমধিক,

স্নেহ কৃপা কৃতজ্ঞতা আছে বিদ্যমান।

....

.....

শাস্ত্র গ্রন্থ আদি যত পড়িয়াছ অবিরত

তত্ত্বজ্ঞান তার মধ্যে লভিয়াছ কত।

নিশ্চয় শিখেছ তুমি সংসার করম ভূমি

গৃহাশ্রম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সর্ব্ববাদী মত।।''[১২]

হরিচাঁদ ঠাকুর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে গৃহধর্ম পালনের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা সমগ্র মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। হরিচাঁদ ঠাকুর সেভাবে গৃহাশ্রম ধর্মের শিক্ষা দিয়েছেন তা ভারতবর্ষীয় সমাজের মূল ভিত্তি। হরিচাঁদ ঠাকুর সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মকে আদর্শ গৃহ ধর্ম পালনের মধ্যেই রক্ষা করার নির্দেশ দেন।

''গৃহস্থ আশ্রম ধর্ম ভূতলে নরের জন্য।

সর্ব তীর্থ সর্ব পুণ্য গৃহাশ্রমে রয়।।

গৃহীকে আশ্রয় করি জীব রহে দেহ ধরি,

গৃহাশ্রম সর্বোত্তম সেই হেতু কয়।''[১৩]

হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব হওয়ার কারণ হিসাবে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার বলেছেন প্রসস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম শিক্ষা ও সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম জানানোর জন্যই হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম।

''প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম জীবে শিক্ষা দিতে।

অবতীর্ণ হরিচাঁদ আসি অবনীতে।।''[১৪]

এই জীব জগতের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষের সমাজের মূলে রয়েছে সৃষ্টি প্রবাহ। সৃষ্টি প্রবাহকে অব্যহত রাখতে মানুষকে বিবাহ করে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করতে হয়। নিজ জন্মদাতা পিতামাতাকে ভগবান জ্ঞানে পূজা করা সন্তানের কর্তব্য। মাতা পিতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা ভক্তি, স্বামী স্ত্রীর প্রতি স্বকর্তব্য পালন, মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন এইসব সামাজিক কর্ম সাধনের জন্য সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মকে গার্হস্থ্য ধর্মের সঙ্গে এক যোগে প্রবর্তন করেন হরিচাঁদ

ঠাকুর। গুরুচাঁদ ঠাকুর বিবাহ করতে অসম্মতি জানালে শান্তিদেবী গুরুচাঁদ ঠাকুরকে বলেছিলেন গৃহধর্ম রক্ষা করতে। গৃহধর্ম ও সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম পালনের জন্য। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য' গ্রন্থে বিচরণ পাগল এভাবে বর্ণনা করেছেন শান্তিদেবীর শিক্ষাকে—

''শান্তিমাতা বলে শুন আমার বচন।
পিতৃধর্ম রক্ষা কর সুযোগ্য নন্দন।।
গৃহধর্ম হয় বাপ সূক্ষ্ম সনাতন।
সৃষ্টিতত্ত্ব মূল সূক্ষ্ম ধর্ম সনাতন।।
সেই ধর্ম পালিবারে অমত কর না।
মোরা না আসিলে তুমি কভু আসিতে না।''[১৫]

পিতা হরিচাঁদ ঠাকুর ও মাতা শান্তিদেবীর আদেশ হল সংসার ধর্ম পালন করে সমাজের সাংসারিক মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। সংসার ধর্ম-কর্ম পালনের মধ্যেই সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করা যায়। মতুয়া ধর্মে গার্হস্থ্য আশ্রমই সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রম। গুরুচাঁদ ঠাকুর ও পরবর্তী সময়ে ভক্তগণকে আদর্শ গৃহধর্ম পালনের নির্দেশ দিতেন। গৃহধর্ম পালনের মধ্যেই ধর্ম জীবন পালন করলে তার মতো মহাসাধু অন্য কোথাও আর পাওয়া যায় না গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতে। শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের আদর্শ গৃহাশ্রমের নীতি শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে—

''গার্হস্থ্য আশ্রম তাই সর্ব্বাশ্রম মূল।
তুলনা মিলেনা তার অমূল্য অতুল।।
এই গৃহাশ্রমে যেবা খাঁটি ভাবে রয়।
তার মত মহাসাধু কোথা পা'য়া যায়।''[১৬]

হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম বা মতুয়া ধর্মকে আদর্শ গৃহ জীবনের মধ্যেই পালন করে মানুষের পূর্ণতা চেয়েছিলেন। ধর্মকর্মের মিলনে সংসার জীবন গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন। সেকথা আচার্য মহানন্দ হালদার বর্ণনা করেছেন এভাবে—

''মতুয়া জীবনে হ'ল পূর্ণ পরাকাষ্ঠা।
গৃহস্থ সন্ন্যাসী মিশি, এক আসনে রহে বসি,
এক ক্ষেত্রে মিলে সব ধর্ম কর্ম নিষ্ঠা।।''[১৭]

হরিচাঁদ ঠাকুর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে ভক্ত মতুয়া সমাজের সকল কর্তব্য কর্ম করার

জন্য নিয়োজিত করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতার আজ্ঞানুসারে মতুয়া ভক্তগণের চারিত্রিক দৃঢ়তা নির্মাণ, সমাজ গঠন, শিক্ষা নিকেতন গঠন, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যথাসাধ্য কর্ম সম্পাদন করেছিলেন ভক্তগণ সহযোগে। গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ভক্তগণের ভবিষ্যৎ কালের কলুষতা মুক্তির উদ্দেশ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন ধর্মাদর্শকে। গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেন—

"দীক্ষা, শিক্ষা কোন কিছু নাহি প্রয়োজন।
হরিনাম মহামন্ত্র জান সর্ব্বজন।।"[১৮]

মতুয়াধর্ম যাতে মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সমাজের মানুষের ধর্মীয় মোহ মুক্তির আদর্শ হয় তার জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতার দ্বাদশ আজ্ঞা মত আরও সাতটি আজ্ঞা পালনের নির্দেশ দেন। এই সাতটি আজ্ঞায় মতুয়াধর্ম সমাজের মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা, চারিত্রিক পবিত্রতা ও নির্ভয় প্রদান করেছেন। মতুয়া ভক্তগণ যাতে ভিন্নদল উপদলে বিভক্ত হওয়া থেকে বিরত হন তার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের এই নির্দেশাবলী থেকে বোঝা যায় মতুয়া ভক্তগণকে সমাজে প্রচলিত কুপ্রথা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের সপ্ত নিষেধাজ্ঞাগুলিকে তুলে ধরলাম। আচার্য মহানন্দ হালদারের গুরুচাঁদ চরিত থেকে সংক্ষিপ্তভাবে—

১. ধর্মক্ষেত্রে মধ্যস্বত্ব জমিদারী লোপ।
২. অঙ্গসেবা বারণ।
৩. পরনারী থেকে দূরে থাকা।
৪. পরিহাস বাচালতা ত্যাগ।
৫. মদ, গাজা প্রভৃতি অস্পৃশ্য।
৬. তাস, দাবা প্রভৃতি পরিত্যাগ।
৭. শঙ্কা ত্যাগ।

মতুয়া ধর্মে 'হরিবোল' নামের অর্থ প্রেমবন্ধন :

হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে 'হরিনাম' সাধনা করার নির্দেশ দেন। মতুয়াধর্মে এক হরিনামই সারবস্তু। হরিচাঁদ ঠাকুর নারী-পুরুষ, সকল মানুষকে 'হরিবোল' মহামন্ত্রের দ্বারা সমস্ত মানুষকে

এক মহান প্রেম বন্ধনে এক সূত্রে আবদ্ধ হতে বলেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের এই আদর্শকে 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার। কবির বর্ণনায়—

''হরিনামে প্রেম প্রাপ্ত সাধুদের বাণী।

.....

যেই নাম সেই হরি শ্রীমুখের বাক্য।

জীবে কেন মনে প্রাণে নাহি করে ঐক্য।

.....

বিশুদ্ধ পিরিতি ব্যাখ্যা আর বাক্য নাই।

শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি নৈষ্ঠিক ভজন।।''[১৯]

সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম বা মতুয়া ধর্মে ব্রহ্ম উপলব্ধি :

ব্রহ্ম জ্ঞান সমস্ত মানুষের মধ্যেই সুপ্ত রূপে বিরাজমান। সঠিক জ্ঞান লাভের দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা মানুষ সুপ্তরূপে বিরাজমান দেহের মধ্যের ব্রহ্ম শক্তির ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ব্রহ্ম জ্ঞানালোক প্রাপ্ত ব্যক্তি সমাজের গৌরব। ব্রহ্ম জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর স্বীয় পুত্র শশীভূষণ ঠাকুরকে। গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছিলেন ব্রহ্মকে বাইরে খোঁজা বৃথা। নিজের মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজ করেন। আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—

'' শোন শশী কিছু তত্ত্ব কহি তব ঠাঁই।

'শক্তিরূপ' ব্রহ্ম তুমি জানিবে সদাই।।

এই শক্তি দেখ রহে জীবের শরীরে।

পরম অমূল্য নিধি বীর্য্যরূপ ধরে।।''[২০]

ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করতে হলে ব্রহ্মচর্য পালনের দরকার হয়। ব্রহ্মশক্তিকে জাগাতে গুরুচাঁদ ঠাকুর নির্দেশ দেন ব্রহ্মচর্য জীবন যাপনের।

''ব্রহ্মচর্য পালে যেই কায়মনো বাক্যে।

ব্রহ্ম তারে রহে ঘিরে সবার অলক্ষে।।

.....

ব্রহ্ম যদি পেতে চাও ব্রহ্মচারী হও।।''[২১]

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর শ্রীশ্রীশশীভূষণ ঠাকুরকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মশক্তির সন্ধানের পথকে উন্মুক্ত করেছেন।

হরিচাঁদ ঠাকুর যে সনাতন ধর্মকে উনিশ শতকে সংস্কার করেন সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে সেই সনাতন ধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারা মনিমোহন বৈরাগী আলোচনা করেছেন। সনাতনী যুগের ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টি ও তার ঐতিহাসিক যুগ ভিত্তিক অবস্থান সহ মূলনিবাসী ভারতীয়দের নানাপ্রকার উত্থান পতনের চার্ট আকারে দেখিয়েছেন মনিমোহন বৈরাগী। তাঁর যুগভিত্তিক চার্টটিকে তুলে ধরলাম—

''মূলনিবাসী ভারতীয়দের যুগভিত্তিক ধর্মীয় অবস্থান ও ধর্মগ্রন্থ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ (৬৫০০ খ্রিস্ট পূর্বের আগে)

সনাতনী ধর্মভাবনার উন্মেষ ঘটে এই সময় থেকে

বৈদিক আর্য পূর্ব পূর্ববুদ্ধ সনাতনী যুগ (৬৫০০-১৫০০ খ্রিঃ পূঃ) সিন্ধু সভ্যতা এ যুগেরই নিদর্শন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম নামক পঞ্চভূতের সনাতনধর্মী আদি পুরাণ সনাতনী ভারতীয়দের এই সময়কার সৃষ্ট জ্ঞান ভাণ্ডার হিসাবে স্বীকৃত।

বৈদিক যুগ

(১৫০০-৫০০ খ্রিঃ পূঃ)

ঋগবৈদিক যুগ	পরবর্তী বৈদিক যুগ
(১৫০০-১০০০ খ্রিঃ পূঃ)	(১৫০০-১০০০ খ্রিঃ পূঃ)

(১৫০০-১০০০ খ্রিঃ পূঃ)

ঋগবেদ এবং ব্রাহ্মণ এই সময়কার সৃষ্টি।

(১০০০-৫০০ খ্রিঃ পূঃ)

শ্যামবেদ, যযুর্বেদ, অথর্ববেদ, আরণ্যক উপনিষদ, ঋগবেদের পুরুষসুক্ত, গৌতমধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি এই সময়ের সৃষ্টি। তবে অথর্ববেদ এবং উপনিষদ সৃষ্টি করেন সনাতনপন্থী অথর্ববেদীয় মূলনিবাসীগণ।

বৌদ্ধযুগ (৫০০-১৮৭ খ্রিঃ পূঃ)

এই সময় ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের ধর্মকে সংস্কার করে গৌতমবুদ্ধ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চার মহাভূতের মহাসত্যের উপর তা প্রতিষ্ঠিত করেন। যার ধর্মীয় বর্হিপ্রকাশ কর্ম ভিত্তিক সত্য প্রেম এবং যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বৌদ্ধধর্ম দর্শন রূপে প্রকাশিত।

মিশ্র যুগ (১৮৭ খ্রিঃ পূঃ ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)

(বৈদিক ধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের মিশ্র অবস্থা)

মনুসংহিতা, বেদান্তসূত্র (উপনিষদের অনুকরণ) মহাভারত (তবে এর রচনাকাল চলে ১২০০ খ্রিঃ পর্যন্ত) গীতা, রামায়ণ, এবং ব্যাসের কলমে আদি পুরাণের বিকৃতরূপ বর্তমানের ১৮টি পুরাণের অধিকাংশের সৃষ্টিই এই সময়ে। যেমন—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বায়ু পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, মৎস পুরাণ (তবে এর রচনাকাল চলে ১১০০ খ্রিঃ পর্যন্ত) ভাগবত পুরাণ, কুর্ম পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, বামন পুরাণ (এর রচনাকাল চলে ১০০০ খ্রিঃ পর্যন্ত), পদ্মপুরাণ (এর রচনাকাল চলে ৯৫০ খ্রিঃ পর্যন্ত), স্কন্দ পুরাণ, ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ।

পরবর্তী বৌদ্ধ যুগ (৭৫০-১১৩০ খ্রিঃ)

ব্রহ্ম নারদীয় পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, গরুড় পুরাণ, ব্রহ্মা পুরাণ, বরাহ পুরাণ (তবে এর রচনাকাল চলে ১৫০০ খ্রিঃ পর্যন্ত) এই সময়ের সৃষ্টি।

মুসলিম যুগ (সূত্রপাত থেকে) ও খ্রিস্টান যুগ ও আধুনিক যুগ

(১১৩০-১৯৪৭ খ্রিঃ)

মহাভারত এবং বরাহ পুরাণের রচনাকাল এই যুগেই শেষ হয়। ঠাকুর হরিচাঁদের জন্ম এবং সনাতন ধর্মের নবরূপ মতুয়া ধর্ম প্রবর্তন। এবং মহান মতুয়া ধর্মগ্রন্থ শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত ও গুরুচাঁদ চরিত তথা অনেক মতুয়া ধর্ম সাহিত্য গান এই সময়ের সৃষ্টি।

আধুনিক যুগ (১৯৪৭-২০১৭ খ্রিঃ)

মতুয়া ধর্ম গ্রন্থ এক অবৈদিক সনাতনী দর্শন হিসাবে বৌদ্ধ ও মতুয়া দর্শন, হরিচাঁদ তত্ত্বামৃত

ইত্যাদি এই সময়ের সৃষ্টি।''[২২]

কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের লেখা 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' থেকে হরিচাঁদ ঠাকুরের বংশ পরিচয় জানা যায়। কবি বংশ পরিচয় এভাবে জানিয়েছেন—

''নাম ছিল রামদাস রাঢ় দেশে ছিল বাস,
তীর্থযাত্রা করি বহুদিন।
স্ত্রীপুরুষ দুইজনে, শেষে যান বৃন্দাবনে,
কৃষ্ণপ্রেমে হয়ে উদাসীন।।
কৃষ্ণনাম উচ্চারণে, ধারা বহিত নয়নে,
হেরিলে পবিত্র হয় জীব।
কাশী কাঞ্চী মধুপুরী, সরস্বতী গোদাবরী,
শান্তিপুর আদি নবদ্বীপ,
বিষয় সম্পত্তি ত্যজ্যে, তীর্থ যাত্রী পদব্রজে,
পরে যান শ্রীচন্দ্রশেখর।
নবগঙ্গানাম শুনি, দেখিবারে সুরধনী,
লক্ষ্মী পাশা এল তার পর।।
কৃষ্ণভক্ত শিরোমণি, সব লোকে ধন্য মানি,
যত্ন করি রাখিল তথায়।
কৃষ্ণ ভকতের সঙ্গে, প্রেমকথা রসরঙ্গে,
থাকিলেন শ্রীলক্ষ্মী পাশায়।।
চন্দ্রমোহন তার পুত্র ক্রমে শুন তার সূত্র,
তার পুত্র সুকদেব নাম।''[২৩]

আমার আলোচনার সুবিধার জন্য ঠাকুর বংশলতাকে নিম্নলিখিতভাবে দেখালাম—

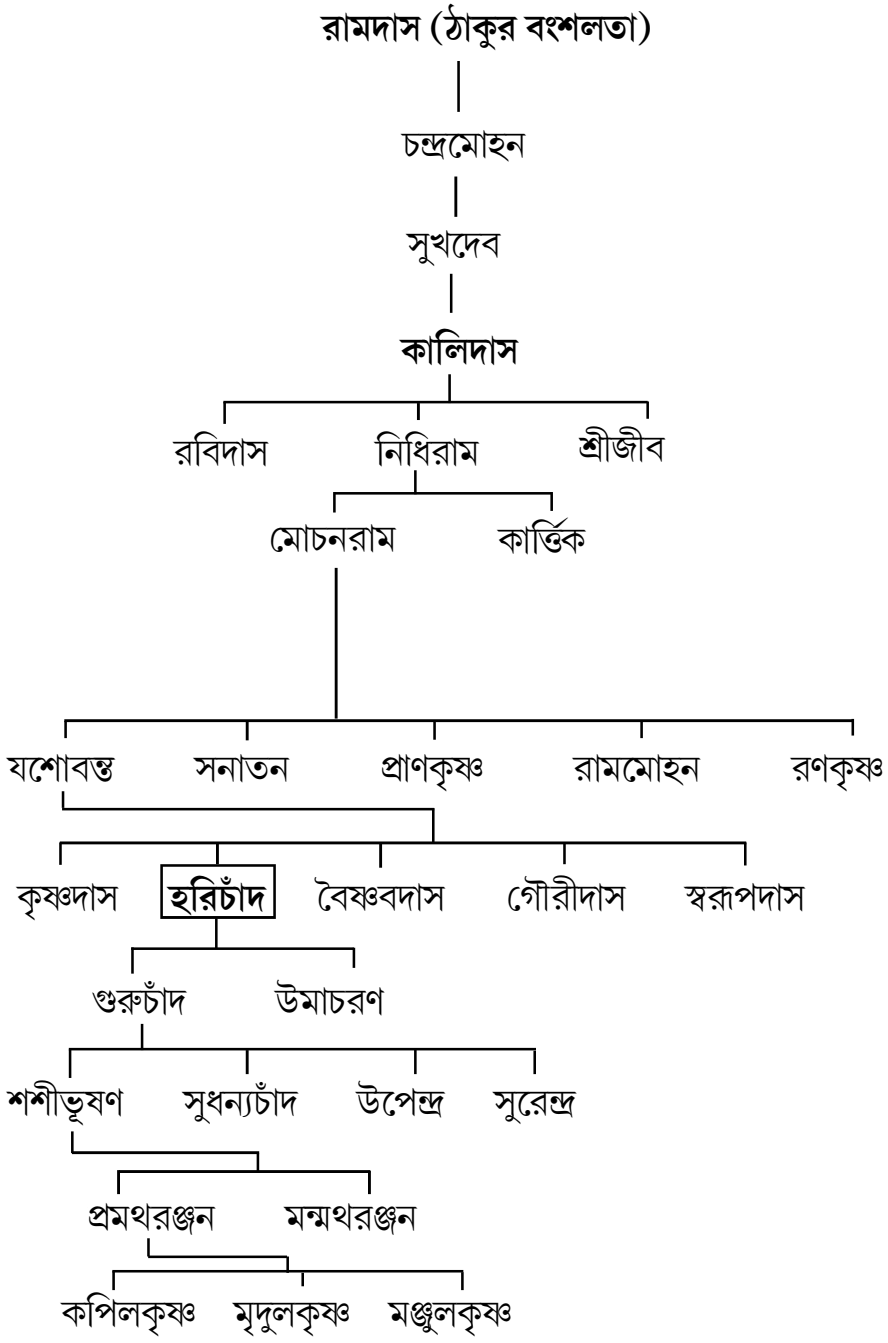

‘‘তস্য পুত্র কালিদাস বহুদিন কৈল বাস,

তিনি যান পাথর ঘাটায়।।

রবিদাস নিধিরাম কনিষ্ঠ শ্রীজীবনাম,

তিন পুত্র সহিত তথায়।।

সর্বদাই সাধু সেবা, সংকীর্ত্তন রাত্রিদিবা,

মাঝে মাঝে বাণিজ্য করিত।

যাহা করে উপাজ্জন তাহাতে সাধুসেবন

ক্ষেত্র কার্য অল্প পরিমিত।।

---------- ----------

---------- ---

শ্রীনিধিরামের ঘরে, দুই পুত্র জন্মধরে,

মোচনরাম, কনিষ্ঠ কার্ত্তিক।।

জেষ্ঠ্য শ্রীমোচন রাম, অশেষ গুণেরধাম,

ঠাকুর মোচাই নামে খ্যাত।

সফলানগরী এসে, বাস করিলেন শেষে,

পঞ্চ পুত্র লয়ে আনন্দিত।।

যশোবন্ত সনাতন প্রাণকৃষ্ণ রামমোহন,

রণকৃষ্ণ এ পাঁচ সন্তান।

র্সব জেষ্ঠ্য যশোবন্ত, তার হ’ল পঞ্চ পুত্র,

এপঞ্চের ঠাকুর আখ্যান।।

এ বংশে জন্মিল যত শুদ্ধ শান্ত কৃষ্ণভক্ত,

সবেমত্ত হরিগুণ গানে।

কৃষ্ণ ভকতির গুণে তার এক এক জনে,

সাধুকি বৈষ্ণব সবে মানে।।

এ কয় পুরুষ মাঝে মত্ত সাধু সেবা কাজে,

কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি নিরবধি।

কেহ বা হল সন্যাসী, কেহ বৃন্দাবনবাসী,

তাতে বংশে ঠাকুর উপাধি।।

ঠাকুরের এ বংশেতে, হরিচাঁদ অবনীতে,

করিলেন জন্মগ্রহণ।।''[২৪]

এছাড়াও 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থ থেকেও ঠাকুরের বংশ পরিচয় জানা যায়। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থটির রচয়িতা আচার্য মহানন্দ হালদার। এটিও আকরগ্রন্থ। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবনী ধর্ম-কর্মময় কাহিনির সমাহার। হরিচাঁদ ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র কীভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরের তিরোধানের পর মতুয়া ধর্মকে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শের মাধ্যমে ভক্ত মানুষের উপকার করেছেন; সেই কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন আচার্য মহানন্দ হালদার তাঁর 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' গ্রন্থে। শিক্ষা ভাবনা, অর্থনৈতিক ভাবনা, রাজনৈতিক সচেতনতা সামাজিক ঐক্য স্থাপনের জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুরের অবদান বিস্ময়কর।

হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতামাতা ও ভাইদের বাল্যকালের পরিচয় :

হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতা যশোবন্ত ঠাকুর ও মাতা অন্নপূর্ণা দেবী। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে তাদের চরিত্র মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে হরিচাঁদ ঠাকুরসহ তাঁর ভাইদের। তাঁদের চরিত্র গঠন ও হয়েছিল পিতা মাতার আদর্শ অনুযায়ী। আলোচনার সুবিধার জন্য আকর গ্রন্থের চরিত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা তুলে ধরলাম—

''সফলা নগরী ধন্য ওড়াকান্দি ধন্য।

যে গ্রামে হরিচাঁদ হৈল অবতীর্ণ।।

সফলা নগরী শ্রীযশোবন্ত ঠাকুর।।

তাহার মহিমা কথা কহিতে প্রচুর।।

কৃষ্ণধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ প্রাণ তার।।

কৃষ্ণের নৈবিদ্য বিনে না হত আহার।।

সদা করে কৃষ্ণ কথা কথোপকথন।

কৃষ্ণ বলে অশ্রুজলে ভাসিত বয়ন।।

প্রতি পক্ষে করাইত বৈষ্ণব ভোজন।

হরি ব্রত একাদশী নাম সংকীর্তন।।''[২৫]

'অথযশোবন্ত চরিত্র কথা'—অংশে যশোবন্ত বৈাগীর চরিত্র মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে—শ্রীশ্রীতারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন—

''ঠাকুর বৈষ্ণব বলে উপাধি যাহার।

আমি মূঢ় কিবা গুণ বর্ণিব তাহার।।

বৈষ্ণব সঙ্গেতে সাধু কীর্ত্তন করিত।

ভাবেতে বিভোর হয়ে কত ভাব হত।।

কোনদিন কৃষ্ণ গোষ্ঠে পোহাইত নিশি।

বৈষ্ণবেরা যশোবন্তে বলিত বৈরাগী।

বৈষ্ণব উপাদি বৈষ্ণবের পদ সেবি।

অন্নপূর্ণা মাকে সবে বলিত বৈষ্ণবী।।

বৈরাগী ঠাকুর আর ঠাকুর বৈষ্ণব।

এহেন উপাধিতে হইল জনরব।।

যতকিছু সংসারেতে করিতেন আয়।

যত্র আয় তত্র ব্যয় বৈষ্ণব সেবায়।।

গো সেবা করিত বহু করিয়া যতন।

দুই তিন গাভী সদা থাকিত দোহন।।

ঘৃত বানাইত দধি করিয়া মন্থন।

বৈষ্ণবেরা দধি দুগ্ধ করিত ভোজন।।

মন্থন সময় হলে বৈষ্ণবাগমন।

বৈষ্ণবের মুখে তুলে দিতেন মাখন।।''[২৬]

উপাস্য ভগবানের নামে ভক্ত মানুষ পরিচিত হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কারের দ্বারা জীবন গঠিত হয়। যশোবন্ত বৈরাগী ও অন্নপূর্ণাদেবী দু'জনেই বৈষ্ণবসেবা করতেন প্রতিপক্ষে। হরিব্রত একাদশী তাদের বাদ যেত না। বৈষ্ণব সেবার দ্বারা তারাও বৈষ্ণব উপাধি পান। এমনকি তাদের সন্তানদেরও নামকরণ করেন বৈষ্ণব ভাবাদর্শের দ্বারা। তাঁদের বড় ছেলের

নাম কৃষ্ণদাস, দ্বিতীয় হরিচাঁদ, তৃতীয় বৈষ্ণবদাস, চতুর্থ গৌরীদাস, পঞ্চম স্বরূপ দাস। 'প্রভুদের বাল্যখেলা' অংশে পঞ্চভ্রাতার বাল্যকালের বর্ণনা করেছেন কবি। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভ্রাতাদের বাল্যকালের চরিত্র সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া রয়েছে তা হল—

হরিচাঁদ ঠাকুরের অগ্রজ কৃষ্ণদাস চরিত্র :

''ফরিদপুর জিলা গ্রাম সফলাডাঙায়।
পঞ্চভ্রাতা জন্মিলেন এসে এ ধারায়।।
প্রভু আগমনে ধন্য হল মর্ত্ত্য পুরী।।
বঙ্গদেশে ধন্য গ্রাম-সফলা নগরী।।
অগ্রগণ্য কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ ভজনেতে।
শুদ্ধচারী কৃষ্ণভক্ত আর্ত্তি বৈষ্ণবেতে।।
একাদশী উপবাসী তুলসী ভজন।
শ্রীহরি বাসর হরিব্রত পরায়ণ।।
নাম সংকীর্ত্তন আদি সদা সাধু সঙ্গ।
অন্তরে মাধুর্য্য শুধু প্রেমের তরঙ্গ।।''[২৭]

হরিচাঁদ ঠাকুরের তৃতীয় ভাই বৈষ্ণবদাস চরিত্র :

''বৈষ্ণব দাসের মন বৈষ্ণব সেবায়।
বৈষ্ণবের সঙ্গে রঙ্গে কৃষ্ণগুণ গায়।।
.....
বৈষ্ণবেরা পাক করে লাবড়া ব্যঞ্জন।
বৈষ্ণব প্রসাদ নিতে বড়ই মনন।।
বৈষ্ণবে নিশ্বাস ছাড়ে হরে কৃষ্ণ বলে।
তখন আমার মনে আনন্দ উথলে।।
যার গলে মালা, ভালে তিলক ধারণ।
তারে গিয়া করিত বৈষ্ণব সম্বোধন।।
তারে গিয়া করিত বৈষ্ণব সম্বোধন।।

বালক নিকটে যেত বাল্য খেলা লাগি।

বলে ভাই এস খেলি বৈরাগী বৈরাগী।।

একত্র হইয়া সব বালকের সনে।

বলে ভাই ভাল মাটি পাব কোন খানে।।

যে স্থানে বিশুদ্ধ মাটি আনিত তুলিয়া।।

অষ্টাঙ্গে লইত ফোঁটা সে মাটি গুলিয়া।।

বৈষ্ণবেরা যেমন পরিত বহির্ব্বাস।

তেমতি পরিত নিজ পরিধান বাস।।

তুলসীর চারা আনি করিত রোপণ।

বলে ভাই হেথা কর নাম সংকীর্ত্তন।।

হরি বলি বাহু তুলি নাচিয়া নাচিয়া।

ভূমে দিত গড়াগড়ি মাতিয়া মাতিয়া।।

নামরসে খেলা বসে মত্ত সুধা পানে।

আহার আদি ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিত মনে।।''[২৮]

হরিচাঁদ ঠাকুরের তৃতীয় ভাই গৌরীদাস চরিত্র :

''গৌরীদাস গুণভাষ কহন না যায়।

অহরহ বদনেতে হরি গুণ গায়।।

থাকিতেন বৈষ্ণব দাসের অনুগত।।

বৈষ্ণব দেখিলে হইতেন পদানত।।

মাতৃ পিতৃ আজ্ঞা মানি করিতেন কার্য্য।

ভাতৃগণ আজ্ঞা করিতেন শিরোধার্য্য।।

পৌগণ্ডেতে বালকের সঙ্গেতে মিশিয়া।

হরি হরি বলিতেন নাচিয়া নাচিয়া।।''[২৯]

হরিচাঁদ ঠাকুরের ছোট ভাই স্বরূপদাস চরিত্র :

''স্বরূপদাসের বাল্য লীলা চমৎকার।
পিতৃসেবা মাতৃসেবা বিশুদ্ধ আচার।।
ভ্রাতৃগণ আজ্ঞাধীন সদা করে কার্য।
ভৃত্যবৎ ভ্রাতৃ পরিচর্য্যাদি গাম্ভীর্য।।
অতিথি বৈষ্ণব পেলে করিত সেবন।
বালক বৈষ্ণব সঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন।।''[৩০]

হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রকথা বর্ণিত হয়েছে 'মহাপ্রভুর বাল্যলীলা' অংশে—

''এই ভাবে চারি ভাই করে বাল্যখেলা।
এবে শুন মহাপ্রভু স্বীয় বাল্য লীলা।।
মহাপ্রভু বাল্যকালে রাখিতেন গরু।।
ধরিয়া গোপাল বেশ বাঞ্ছা কল্পতরু।।
আবা ধ্বনি দিয়া করে ধরিতেন তাল।
আনন্দে করিত নৃত্য গোধনের পাল।
গোপনীয় ভাব যেন ছিল বৃন্দাবনে।
করিত তেমনি খেলা রাখালের সনে।।
ব্রজেতে যেমন ভাব ছিল ভঙ্গি বাঁকা।
সেই ভাবে দাঁড়াতেন যষ্ঠি দিয়ে ঠেকা।।
ভাব দেখে রাখালেরা জিজ্ঞাসিত নাম।
বলিতেন নাম কৃষ্ণ দূর্ব্বাদল শ্যাম।।''[৩১]

কৃষ্ণদাস, বৈষ্ণবদাস, গৌরীদাস, স্বরূপ দাসের যে চরিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে দেখা যায় তাদের পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী কর্মধারার পরিচয়। এবং বৈষ্ণব পরিবারের বৈষ্ণব সন্তানদের চরিত্র, তাদের আচার আচরণ ক্রিয়া কর্ম পিতৃ মাতৃ অনুরূপ হবে এটাই সাধারণ রীতি। এখানেও সেই নিয়মানুযায়ীই তাদের চরিত্রের নানা দিক ফুটে উঠেছে। বৈষ্ণবের ক্রিয়াকর্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবভক্তদের পালনীয় রীতি নীতিরই ব্যবহার দেখা যায়—যথা;

নামসংকীর্ত্তন, একাদশী উপবাস, তিলক ধারণ, তুলসী পূজা, নামসংকীর্ত্তন বাহু তুলে হরিনাম করা, নিরামিষ ভোজন, আহারের পরিচয় পাই তা একান্তই বৈষ্ণব ভক্তির পালনীয় রীতির পরিচায়ক। ভক্তির লক্ষণ অর্থাৎ প্রণাম করাও তাদের মধ্যেই রয়েছে সমভাবে ব্যক্ত।

হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্র থেকেও ভগবদভক্তির কথাই মনে পড়ে। একে তো হরিচাঁদ ঠাকুরের পরিবার ছিল বৈষ্ণব পরিবার আর তৎকালীন সমাজে কৃষ্ণভক্তির ভাবধারা যে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল তা আমরা হরিচাঁদ ঠাকুরের বংশাবলীর থেকে জানতে পারি। হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্ব সময়েও এই ভাব ধারা যে ছিল তার পরিচয়ও আমরা পেয়েছি। আর হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রটিও ভক্তি ভাবনার দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম লগ্নের অনেক আগে থেকেই এই পরিবারে তথা এ সময়ের সমাজের যে ধর্ম শিক্ষা প্রচলিত ছিল তাতে দেখা যায় পুরাণগুলি ধর্ম সাহিত্য হিসাবে পরিচিত ছিল, এছাড়াও মনসামঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্র কথা জানার মাধ্যমে যেমন হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রের দৃঢ়তা, সত্যবাদিতা, কর্মদক্ষতা, ন্যায় পরায়ণতা, তথা একটি আদর্শ চরিত্রের যা কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তা বাল্যকাল থেকেই লক্ষ করা যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রও সেই প্রথম লগ্নেই বোঝা গিয়েছিল তার সমগ্র জীবনের তথা কর্মজীবনের কাঠামোটির স্বরূপ। 'মহাপ্রভুর গোপাল বেশ' অংশটিতে দেখা যায় গোচারণের সময় রত্নডাঙায় বিভিন্ন সাপের দেখা পাওয়া যেত। তখন হরিচাঁদ ঠাকুর নিজে সেই সাপ ধরে খেলা দেখাতেন রাখাল বন্ধুদের। এতে বোঝা যায় তাঁর চরিত্রে প্রথম থেকেই ভীতি হীনতার পরিচয়। আর তিনি কেবলমাত্র খেলা দেখাতেন তা নয় 'মনসা ভাষাণ গান' গাইতেন। এ থেকে বোঝা যায় তৎকালীন সময়েও যে গ্রামাঞ্চলের বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল মনসাভাষান গানের। কবির বর্ণনায়—

''গোষ্ঠেতে দেখিলে সর্প, করিতেন ঘোর দর্প,
ধেয়ে গিয়া করিত ধারণ।।
দেখি ঠাকুরের দর্প পালাইত কাল সর্প,
কোন সর্পে ধরিতেন ফণী।।
ঠাকুর পানে চাহিয়ে সভয় প্রণাম হয়ে
ফিরে দূরে যাইত অমনি।।

কোন ফণী বৃক্ষ পরে, ঠাকুর দেখিলে পরে,

বলিতেন রাখাল গণেরে।।

এনে দেরে বেত্র শিষ, তোরা অন্তরে থাকিস,

আমি আনি ঐ ফণী ধরে।।

শিষ অগ্র ফিরাইয়া, তাতে এক গ্রন্থি দিয়া,

ফাঁসী বানাইয়া ধরে ফণী।

ফণী টানিয়া আনিয়া, গোষ্ঠের মাঝারে গিয়া,

ছেড়ে দিয়া খেলিত অমনি।।

গাইত পদ্মপুরাণ মনসা ভাষাণ গান,

বেহুলার করুণ কাহিনি।

রাখালে দিতেন বলি আমি সাপ লয়ে খেলি

তোরা নাচ দিয়া হরিধ্বনি।।''[৩২]

হরিচাঁদ ঠাকুরের বালক বন্ধুদের পরিচয় :

''নাটু আর বিশ্বনাথ থাকিত ঠাকুর সাথ,

হরিচাঁদ প্রেমে বড় আর্ত্তি।।

যেখানে যেখানে যেত, সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইত

কার্য্য করে আজ্ঞা অনুবর্তী।।

লইয়া রাখালগণ করে গোষ্ঠ গোচারণ,

কভু বসে বৃক্ষের ছায়ায়।।''[৩৩]

'রাখাল বিশ্বনাথের জীবনদান' অংশ দেখা যায় হরিচাঁদ ঠাকুরের খেলার সাথী বিশ্বনাথ মৃত্যু পথের যাত্রী হয় ভেদ বমিতে। আর তৎকালীন সময়ে এই ভেদবমিতে গ্রামের মানুষের মৃত্যু ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াত। আধুনিক কালের মত ডাক্তার ছিল না। তখন জীবনের রোগ শোক সমস্ত ব্যাপারেই মানুষ সংকুচিত হয়ে থাকত। তাই বিশ্বনাথকে অন্তর্জ্জলি করার কথায় হরিচাঁদ ঠাকুর প্রতিবাদ করেন যে এই তুচ্ছ ভেদ বমিতে বিশে মারা যেতে পারে না। আর

হরিচাঁদ ঠাকুরের সহায়তায় মৃতপ্রায় বিশে প্রাণ ফিরে পায়। তাঁর ক্রিয়া কর্মগুলিও প্রথম থেকেই তাই আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত একজন আদর্শ দৃঢ় নিষ্ঠ মানুষকে পাওয়া যায়।

'বিশ্বনাথের জীবনদান' অংশের বর্ণনায় হরিচাঁদ ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনায়—

''বিশ্বনাথ নামে এক রাখাল চতুর।
আত্মাসম ভাল তারে বাসিত ঠাকুর।।
সকল রাখাল এল গোষ্ঠ গোচারণে।
বিশ্বনাথ এল না দৈবের নির্ব্বন্ধনে।।
ঠাকুর বলেন তবে সব সখাগণে।
সকলে আসিলি তোরা বিশে কোন খানে।।
নাটু কহে ওহে হরি কি কহিব আর।
আসিলাম বলিতে বিশের সমাচার।।
বিশের হয়েছে রাত্রে বিসূচিকা ব্যধি।
মৃতপ্রায় সবে করিতেছে কাঁদাকাঁদি।।
ঠাকুর বলেন নিদানের কর্তা আমি।
বিশাইর কি করিবে তুচ্ছ ভেদ বমি।।
নাটুকে করিয়া সঙ্গে ঠাকুর চলিল।
হেনকালে বিশ্বনাথ অজ্ঞান হইল।।
বিশাইর হইয়াছে মৃত্যুর লক্ষণ।
ঘনশ্বাস বহে তার উত্তার নয়ন।।
বিশারে বাহিরে নিয়া কর অন্তর্জ্জলি।।
হেনকালে প্রভু নাটু সঙ্গে তাড়াতাড়ি।
উঠিতেছে হরিচাঁদ বিশেদের বাড়ী।।
বিশার জননী কাঁদে আগুলিয়া পথ।
বলে আজ ছেড়ে যায় তোর বিশ্বনাথ।
আর কি করিবি খেলা লয়ে বিশ্বনাথে।।

প্রভুবলে আইলাম বিশারে কিনিতে।।

ঠাকুর বলেন বিশে শীঘ্র উঠে আয়।

বয়ে যায় রাখালিয়া খেলার সময়।।

খেলা ছাড়ি কেন বা রইলি অন্তর্জ্জলে।

অন্তর্জ্জলে তুই দেখে মোর অন্তর জলে।।

এতবলি হস্ত ধরি বিশারে তুলিল।

নিদ্রাভঙ্গে যেন বিশে গোষ্ঠেতে চলিল।।

বিশ্বনাথ গোঠে গেল ঠাকুরের সঙ্গে।

রাখাল মণ্ডলে গিয়া খেলা করে রঙ্গে।।

উঠিল মঙ্গল রোল জুড়িয়া মেদিনী।

বাল বৃদ্ধ যুবা করে জয় জয় ধ্বনি।।

কেহ বলে বলে রামকান্ত দিয়াছিল বর।

এছেলে মনুষ্য নয় ব্রহ্ম পরৎ পর।।''[৩৪]

হরিচাঁদ ঠাকুর যে পরবর্তীকালে সকলের প্রিয় হরিচাঁদ ঠাকুর রূপে পরিচিত হবেন এ যেন তারই প্রথম প্রকাশ। রাখালের সঙ্গে গোচারণ সময়ে সকল রাখালের সঙ্গে খেলা করতেন। ফুলসাজে সাজতেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে—

''রাখাল সঙ্গেতে করিতেন গোচারণ।

নতুন মাধুর্য্য খেলা খেলিত তখন।।

গোপাল রাখিতে হত গোপাল আবেশ।

গোপালক সঙ্গে হোত গোপালের বেশ।।

খেলিতে খেলিতে সঙ্গীগণ সমিভ্যরে।

যাইতেন রত্নডাঙ্গা বিলের ভিতরে।।

বলিতেন সঙ্গীগণে থেকে বিলকূল।

উঠাইয়া আন গিয়া কস্তুরীর ফুল।।

আন ভাই অই ফুল আমি অঙ্গে পরি।

রাখালেরা এনে দিত কুসুম কস্তুরী।।

সেই কস্তুরীর ফুল পরিত কর্ণেতে।

পদ পরে পদ রেখে দাঁড়াত ভঙ্গীতে।।''[৩৫]

হরিচাঁদ ঠাকুরের পরিবারটি ছিল পূর্ব থেকেই রামকান্তের সহায়তায় বাসুদেব কৃষ্ণ ভক্ত। আর হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রের ক্রিয়া কর্মের যে রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায় প্রথম থেকে। তাঁকে পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাব ধারার মানুষ বিভিন্ন ভাবে ভক্তির চোখে দেখতেন। তাই তিনি কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণ, চৈতন্য ভক্তের শ্রীচৈতন্য, আবার রামভক্তের রাম, আবার কখনো লক্ষ্মী নারায়ণের ভক্তের সেই লক্ষ্মী নারায়ণ রূপী শান্তিদেবী ও হরিচাঁদ ঠাকুরকে কল্পনা করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ভক্তরা। আসলে ভক্তি ভাবনার গভীরতাই প্রকাশিত হয় এই কল্পনার মাধ্যমে। হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তের এই শ্রদ্ধা ভক্তিকে উপেক্ষা না করেই সেই ভক্তি ভাবনাকে মূল শক্তি হিসাবে গ্রহণ করে তিনি তাদের ধর্ম জীবন ও কর্মময় ও সুখময় জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের সমকালে ও তৎপূর্ববর্তী এবং বর্তমান সময়েও একটি জনপ্রিয় ভক্তিবাদ রাম ভক্তি ধারা। এবং রামায়ণ ও মহাভারত যে মহাকাব্য তা সাহিত্য বিচারের সময়। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত ধর্ম সাহিত্য হিসাবেও জনপ্রিয় কাব্য। তাই তৎকালীন সময়ে রামায়ণ গান একটি উল্লেখযোগ্য গান। রামায়ণ গান গ্রামাঞ্চলের মানুষের একটি পরিচিত গান। কীর্ত্তনীয়ারা গ্রামে গ্রামে রামায়ণ গান পরিবেশন করতেন। তাই 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতে' পাওয়া যায়—'মাঝে মাঝে শুনে থাকি গীত রামায়ণ।।' রামায়ণ কাহিনির জনপ্রিয়তা ছিল তৎকালীন সময়ে। রামায়ণের অন্যতম কাহিনি যে রাম থেকেই আশ্বিন মাসে অম্বিকা পূজা হয়। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে তার বর্ণনা পাওয়া যায়—

''অকালে বোধন করে রাম দয়াময়।

কস্তুরী কুসুম পেয়ে দেবী তুষ্ঠা হয়।।

বসন্তে বাসন্তী দুর্গা পূজিত সবায়।

রাম হতে আশ্বিনে অম্বিকা পূজা হয়।।''[৩৬]

সাহিত্য যেমন আধুনিক সমাজের দর্পণ, তেমনি ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতেও ধর্ম ভাবনা, তৎকালীন সমাজ ও সমকালের ঘটনাবলীর প্রতিফলন থাকে। এই ধর্ম সাহিত্যগুলিতে অবতার

বা মহামানবের অলৌকিক ও লৌকিক জীবনের মধ্যে দেশ কাল ও সমাজের বাস্তব ঘটনাবলীর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। আমার আলোচ্য কবি রসরাজ তারকচন্দ্র সরকার রচিত 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের মর্ত্যজীবনের লীলাকাহিনির মধ্যে সেই সব মানুষের কথা বলা হয়েছে—যারা শুধু দিলে পেলে না কিছুই। হরিচাঁদ ঠাকুর উনিশ শতকের ঊষালগ্নে বঙ্গদেশের জরাজীর্ণ সমাজ সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় অনাচার ব্যভিচারের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। তিনি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মের শুধুমাত্র সংস্কার চান নি, চেয়েছিলেন তার আমূল পরিবর্তন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ কৃষক ও গ্রামজীবনের মানুষেরা কীভাবে তিলে তিলে নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত হচ্ছে সেই বেদনার ইতিহাসকে ধর্মের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধে উদ্বোধিত করে তিনি তাদের ভাষা দিয়েছিলেন। তারই কাহিনি পরপর অধ্যায়ক্রমে আলোচনা করব।

তথ্যসূত্র :

১. ঘোষ, বিনয়, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০), প্রকাশভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, অক্টোবর, ২০০৯, পৃ. ৩২০-৩২১।

২. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, ৪র্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪৯।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬-২৫৭।

৭. বিশ্বাস, নীতিশ, সম্পাদনা, শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর স্বর্ণ সংকলন, ৮৮, এম. জি. রোড, কলকাতা-৭০০০৭৩, মে, ২০১৫, পৃ. ১১৪।

৮. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, ৪র্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

১০. হালদার, আচার্য মহান্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশন, বীণা পাণি প্রেস,

ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫।

১১. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, ৪র্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪৯।

১২. হালদার আচার্য মহান্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশন, বীণা পাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৪১।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

১৪. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, ৪র্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪৭।

১৫. পাগল, বিচরণ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য, প্রথম প্রকাশ, প্রকাশক, আমতলী বরিশাল, পৃ. ৩৪।

১৬. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, ৪র্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫৮।

১৭. হালদার, আচার্য মহান্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশন, বীণা পাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৭০।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৩।

১৯. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, ৪র্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪।

২০. হালদার আচার্য মহান্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশন, বীণা পাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪৮।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৮।

২২. বৈরাগী, মনিমোহন, অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম, দ্বিতীয় প্রকাশ, প্রকাশক, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১১ মার্চ, রবিবার, ২০১২, পৃ. ৯৫।

২৩. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, ৪র্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২-১৩।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।